সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records

Vol. 26 | No. 1 | 1982

Check for updates

Volume	26
Issue	1
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	গোলাম মুস্তাফা
Published online	December 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v26i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i1.9
Pages	228-239
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records, Anisuzzaman, India Office Library and Records, 1981, iii+300 pages, price £ 24·00

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'চারহাজারেরও বেশী বাংলায় লেখা চিঠি-পত্র ও দলিলের বিবরণ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সাম্প্রতিক গ্রন্থ Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records (অতঃপর 'ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্স' নামে উল্লিখিত হবে)। আলোচ্য গ্রন্থে তালিকাবদ্ধ দলিল ও চিঠিপত্র রচিত হয়েছে ১৭৭৪-১৮১৪ সালের মধ্যে। ড: আনিসুজ্জামান প্রতিটি চিঠি ও দলিলের ইংরেজী সারসংক্ষেপ তৈরী করেছেন এই বইয়ের জন্য। অধ্যাপক ব্লুমহার্টের তালিকায় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির যে সব বাংলা পাণ্ডুলিপির বিবরণ আছে 'ফ্যাক্টরি করেসপণ্ডেন্সে' সেগুলোর উল্লেখ নেই। এটি ব্লুমহার্টের তালিকারই সম্পূরক।

'ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্সে' তালিকাবদ্ধ চিঠিপত্র ও দলিলগুলোর মধ্যে আছে :

ক) ঢাকা ফ্যাক্টরি এবং এর অধীনস্ত আড়ংগুলোর (বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র) ২২০৫টি চিঠি। চিঠি গুলো ১৭৯২-১৮০০ সালের মধ্যে রচিত ;

খ) বস্ত্র ব্যবসায়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিনিয়োগ ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত ঢাকা ফ্যাক্টরির ষোলটি হিসাব খাতা। খাতাগুলো ১৭৯১-১৮০৯ সালের ;

গ) মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর ফ্যাক্টরি ও তিনটি আড়ং এর ১৭৯৫-৯৬ সালের হিসাব খাতা ;

ঘ) কাশিমবাজার ফ্যাক্টরির ১৮০০-০১ সালের হিসাব খাতা ;

ঙ) জাহাঙ্গীরনগর চাকলার ১৭৭৭-৭৮ সালের, মেদিনীপুর ও জালাসোরের ১৭৮৩ সালের, কৃষ্ণনগর ও বেলান্দিয়ার যথাক্রমে ১৮০৭ ও ১৮০৮সালের রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ এবং চব্বিশ পরগণার কালেক্টরেটের ১৮১০ ও ১৮১৩ সালের রাজস্ব নির্দেশাবলী :

চ) ঢাকার আপীল আদালত ও হুগলীর জেলা আদালত ও সদর দিওয়ানী আদালতের ২৭টি মামলার বিবরণ এবং যশোহর (১৭৯০), বর্ধমান (১৭৯৭) ও চব্বিশ পরগণার জেলা কোর্টের হিসাব সংক্রান্ত নথিপত্র ;

ছ) জর্জ বোগলের ব্যক্তিগত সংগ্রহের কিছু কাগজ ;

জ) ব্রায়ান হডসনকৃত শব্দার্থ সংগ্রহের একটি পাণ্ডুলিপি ;

ঝ) ১৭৯৭, ১৮১০ ও ১৮১৩ সালের তিনটি বিভিন্ন ধরনের কাগজ।

উপর্যুক্ত দলিলপত্রের বিবরণ ছাড়াও 'ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্সে'র পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে ১৩টি চিঠি ও দলিলের প্রতিলিপি, সেগুলোর ইংরেজী অনুবাদ, গ্রন্থ-মধ্যে উল্লিখিত ইংরেজ সিভিলিয়নদের পরিচয়, আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের তালিকা ও সেগুলোর বিবরণ, চিঠি ও দলিলগুলোয় ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী

শব্দের অর্থ / ব্যাখ্যা এবং ১৭৯৯ সালে তাঁতিদের জন্য জারী করা বেঙ্গল রেগুলেশনস এর কিছু অংশ। এই সাথে যুক্ত হয়েছে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের একটি দীর্ঘ ও মূল্যবান ভূমিকা।

আলোচ্য চিঠি ও দলিলগুলো ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির সংগ্রহে কি করে স্থান পায়? এই কাগজ পত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গ্রন্থকার এই প্রশ্নের সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেছেন। বোগল ও হড্সনের কাগজগুলো ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংগৃহীত হওয়ার ব্যাপারটি সহজেই অনুমেয়। চব্বিশ পরগণার রাজস্ব দলিলের জন্য ইংলণ্ড থেকে তলব এলে, ১৮১৩ সালে সেগুলো কোলকাতায় প্রেরিত হয়। পরে কোন এক সময়ে তা পাঠানো হয় লণ্ডনে। সম্ভবতঃ হেইলীবারী কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্যই এগুলোকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। জঙ্গীপুর ফ্যাক্টরির ১৭৯৫-৯৬ সালের হিসাব খাতার নকল ১৮১০ সালে কোলকাতায় কিংবা ইংলণ্ডে পাঠানো হয় একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। অবশ্য এই 'বিশেষ উদ্দেশ্য' সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানা যায়নি। ফ্যাক্টরির কার্যকলাপ নিয়ে তদন্তানুষ্ঠান কিংবা হেইলীবারী কলেজের ছাত্রদের হিসাব বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এই খাতা লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অনুমান করা যায়। অন্য চিঠিপত্র ও কাগজগুলো সম্পর্কে এ-ধরনের কোন তথ্য-সূত্র পাওয়া যায়নি। অল্প কয়েকটি ছাড়া (IO Bengali 4057-62) ঢাকা ফ্যাক্টরির অধিকাংশ চিঠি ও হিসাব খাতাই ফ্যাক্টরির আবাসিক বাণিজ্য কর্মকর্তা জন টেলরের কার্যকালে রচিত। তাঁর আমলে ফ্যাক্টরির কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। হয়তো এ'জন্যই কাগজগুলো বিলেতে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তাধীন সময়ের (১৭৭৮-৭৯) কোন কাগজ এই সংগ্রহে নেই। এ'ব্যাপারে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান অন্য একটি সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ জন টেলর ১৮০৯ সালে দেশে ফেরার সময় ঢাকা ফ্যাক্টরির কাগজগুলো সাথে করে নিয়ে যান। পথিমধ্যে জাহাজে তিনি মারা যান। পরে এগুলো ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির সংগ্রহে ঠাঁই পায়।

ইণ্ডিয়া অফিসের এই বিপুল সংগ্রহ গবেষকদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এতকাল ধরে অনাবিষ্কৃত ও অনালোচিত থেকে যায়। ১৯৭৪-৭৫ সালে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের উপর কাজ করতে গিয়ে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আকস্মিক ভাবে এই লাইব্রেরিতে ১২ খণ্ড চিঠি পত্র, ২৮টি হিসাব খাতা ও মামলার বিবরণ সম্বলিত কিছু কাগজ পত্রের সন্ধান পান। লাইব্রেরির প্রাচীন ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ এস. জে. সি. ও কীফ-এর পরামর্শানুযায়ী তিনি প্রাপ্ত কাগজপত্রের একটি তালিকা তখন প্রণয়ন করেন। ১৯৭৭ সালে এগুলোর একটি বিস্তৃত তালিকা করা হয়। পরের বছর ১৭ খণ্ড চিঠি পত্র সহ আরও বহু সংখ্যক কাগজ পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৭৯ সালে ঐগুলোর তালিকা তৈরী করা হয়। 'ফ্যাক্টরি করেসপন্ডেন্সে' এই চিঠি ও দলিল গুলোকে অত্যন্ত যত্ন, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে একত্রে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।

এর আগে অধ্যাপক জে. সি. ঘোষ সম্ভবতঃ এ'গুলোর পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। কোন কোন কাগজ-পত্রের গায়ে পেন্সিলে লেখা কিছু মন্তব্য দেখে ড. আনিসুজ্জামান এই অনুমান করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক ঘোষ শেষ পর্যন্ত এই কাজ সম্পাদন করে যেতে পারেননি।[৩]

এই দলিল ও চিঠি-পত্রের গুরুত্ব বহুমাত্রিক। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত বাংলা চিঠি পত্র ও দলিলের এত বিপুল সংগ্রহ ইতোপূর্বে আবিষ্কৃত হয়নি। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রাথমিক তথ্যের আকর হিসেবেও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

২

বাংলা গদ্যের ইতিহাসকে আমরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সমসাময়িক হিসেবেই বিবেচনা করে আসছি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পূর্বে রচিত বাংলা গদ্য নিদর্শনের অপ্রতুলতার জন্যই এই সিদ্ধান্ত প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। চণ্ডীদাসের 'চৈত্যরূপ প্রাপ্তি' ও রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরানের' বিক্ষিপ্ত গদ্য নিদর্শনকে বাংলা গদ্যের আদিমতম লিখিত রূপ হিসেবে স্বীকার করে নিলেও ঐতিহাসিকরা বাংলা গদ্যের প্রাচীনত্বের দাবী স্বীকার করেন নি। সজনীকান্ত দাস ১৭৪৩কে ('কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' এর প্রকাশকাল) বাংলা গদ্যের প্রামাণিক যুগের সূত্রপাত ধরে নিয়ে এর পূর্ববর্তী সময়কে 'বাংলা গদ্যের অন্ধকার যুগ' আখ্যা দিয়েছেন।[৪] অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কর্তৃক আবিষ্কৃত চিঠি পত্র ও দলিলের এই বিপুল সংগ্রহ বাংলা গদ্যের ইতিহাস সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন ও মীমাংসার জন্ম দিতে পারে।

এ' পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বাংলায় রচিত চিঠি ও দলিলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যথাক্রমে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে।[৫] কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের চিঠিটি (১৫৫৫) বাংলায় রচিত প্রাচীনতম পত্র ও ভারামল্ল রায়ের দানপত্রটি প্রচীনতম দলিল হিসেবে বিবেচনা করলেও (শ্রী সুকুমার সেন এগুলোর প্রামাণিকতা বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন) ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে (১৮০০ পর্যন্ত) রচিত বাংলা চিঠি পত্র ও দলিলের এ'পর্যন্ত প্রাপ্ত সংখ্যা খুব বেশী নয়। 'ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্স' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল[৬] ও ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের[৭] গ্রন্থদ্বয়ে প্রাচীন বাংলা চিঠি ও দলিল পত্রের কিছু সংগ্রহ আমরা দেখেছি। এই বই দু'টিতে ১৮০০ সালের মধ্যে রচিত চিঠি ও দলিলের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৬ ও ৭৮টি। শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহ থেকে এনে সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের দুটি নিদর্শন প্রকাশ করেছিলেন 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য়। অন্যান্য কয়েকটি স্থানে উল্লিখিত চিঠি ও দলিল সহ ১৮০০ সালের মধ্যে রচিত বাংলা গদ্য নিদর্শন ইতোপূর্বে যা পাওয়া গেছে তা সংখ্যায় অনধিক দেড়শত।

ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্সে আমরা ১৭৯২-১৮০০ সালের মধ্যে রচিত চিঠি পত্র পেয়েছি ২২০৫টি। বাংলা গদ্যের ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহীদের কাছে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। এই গ্রন্থে তালিকাবদ্ধ যে সব দলিল ১৮০০ এর মধ্যেই রচিত সেগুলো হচ্ছে : ঢাকা ফ্যাক্টরির সাতটি ও জঙ্গীপুর ফ্যাক্টরির সতেরটি হিসাব খাতা, জাহাঙ্গীর নগর, মেদিনীপুর ও জালামোর চাকলার রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্রের দুটি খণ্ড, ঢাকা কোর্টের আঠারটি মামলার বিবরণ ও জর্জ বোগলের নথিপত্র গুলো। অন্যান্য দলিলপত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর (১৮০১-১৪)।

বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, রাজস্ব ও আইন আদালতের কাজে বাংলাগদ্যের এই বিপুল ব্যবহারের ঘটনা নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা ভাষার তখন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছিলনা। ফার্সী ছিল রাজভাষা। এর কিছুকাল পর ইংরেজী সেই স্থান দখল করে। তবু বাংলাই ছিল সকল কর্মকাণ্ডের বাহন—এই দলিল গুলো সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে আশ্রয় করেই বাংলা গদ্য বিকশিত হয়েছে এই ধারণা আমাদের মধ্যে প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পূর্বেও বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের এত ব্যাপক ব্যবহারের ঘটনা এর আগে আমাদের জানা ছিলনা। 'ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্সে'র কাগজপত্রে প্রশাসনিক প্রয়োজনে (রাজস্ব ও মামলার বিবরণ) ব্যবহৃত বাংলা গদ্য নিদর্শনের সংখ্যা কম নয়। বাণিজ্যিক চিঠি পত্রের

সংখ্যাও প্রচুর। বাংলা গদ্যভাষায় এত বিচিত্র ধরনের কাজ সম্পাদিত হওয়ায় এই প্রমাণ থেকে এ'কথা এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই বাংলা গদ্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতা অর্জন করেছিল।

ভাষার এই প্রকাশ ক্ষমতা নিশ্চয়ই একদিনে বা আকস্মিকভাবে অর্জিত হয়নি। এর পেছনে, অনুসন্ধান করলে পাওয়া যেতে পারে ধারাবাহিক চর্চার এক দীর্ঘ ইতিহাস। আরও অনুসন্ধানের ফলে প্রাচীনতর গদ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা অনুজ্জ্বল নয়। প্রাপ্ত চিঠি ও দলিলগুলোর শরীরে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে। এ'গুলোর বাংলা পাঠ প্রকাশিত হলে এ' সম্পর্কে অধিকতর তথ্য জানা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বাংলা গদ্য চর্চা ও এর বিকাশের ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের অবদানের শ্রম ও অবদানের কথা বিস্মৃত না হয়েও বলা চলে, তাঁদের পেছনেও ছিল বাংলা গদ্য রচনার এক বিরাট ঐতিহ্য। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এই লুপ্ত ঐতিহ্যের এক বিপুল সংগ্রহের সন্ধান আমাদেরকে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে গবেষকগণ আরও উদ্যোগী ও অনুসন্ধানী হলে হয়ত 'বাংলা গদ্যের অন্ধকার যুগ' অচিরেই তিরোহিত হবে।

আলোচ্য দলিল ও চিঠিপত্রে ভাষাতাত্ত্বিকদের জন্যও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। ঢাকা ফ্যাক্টরির চিঠিগুলোর মধ্যে দু'ধরনের চিঠি পাওয়া গেছে। ক. আড়ংগুলো থেকে ফ্যাক্টরিতে পাঠানো চিঠি—এ'গুলো অধস্তনের কাছ থেকে উর্ধ্বতনের কাছে লিখিত। খ. ফ্যাক্টরি থেকে আড়ং এ লেখা চিঠি। এ'গুলো উর্ধ্বতনের কাছ থেকে অধস্তনের কাছে লিখিত। প্রকরণ ও রচনারীতিতে চিঠি গুলোর পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমোক্ত চিঠিগুলোর সম্বোধন অলংকার বহুল, রচনা ফার্সী প্রভাবিত এবং বক্তব্য আনুষ্ঠানিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর চিঠি সাদা মাটা ও প্রত্যক্ষ ধরনের। পূর্ব বাংলার কথ্য ভঙ্গি কোন কোন চিঠির শরীরে প্রবেশ করেছে, কোনটি আবার রচিত হয়েছে পদ্য প্রকরণে। আরবী, ফার্সী ও হিন্দুস্তানী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর—অনেক সময় ভুল অর্থেও।[৮]

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান রাজস্ব ও আইন সংক্রান্ত কাগজপত্রে ফার্সী ও আরবী শব্দের ব্যবহার বাহুল্য লক্ষ্য করেছেন। প্রচলিত বাংলা শব্দ পরিহার করে অনেক সময় নতুন আরবী ফার্সী শব্দচয়ন করা হয়েছে। যেমন, 'বদমাশ' এর বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 'নেকমাশ'।[৯]

আড়ং এর গোমস্তারা চিঠিগুলোর ইংরেজী সার সংক্ষেপেও আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্তানী শব্দ ব্যবহার করেছে নির্দ্বিধায়। আমানত, দরখাস্ত, ফাজিল, কিস্তবন্দী, রকমফের ইত্যাদি শব্দ ইংরেজী বাক্য-শরীরে প্রবেশ করেছে এদের কল্যাণে। অনেক উদ্ভট শব্দও নির্মাণ করা হয়েছে যেমন ফার্সী শব্দ 'ফেরত' এর সঙ্গে ইংরেজী অতীতবাচক চিহ্ন-'ed' যোগ করে করা হয়েছে 'ferreted'[১০]।

মামলার বিবরণ গুলো বাংলায় মিলিত হলেও ১৭৯৪ ও ১৭৯৫-৯৬ সালের মামলার যে সব বিবরণ পাওয়া গেছে সেগুলো আরবী লিখনরীতি অনুযায়ী ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা।[১১] প্রাপ্ত অন্যান্য মামলার বিবরণ ও কাগজ পত্রে এ'ধরনের রীতি মেলেনা।

'ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্সে'র চিঠি ও দলিলগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের (১৭৭৪-১৮১৪) সাক্ষ্য বহন করেছে। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট, ১৭৯৩ এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ১৮১৩ সালের সনদ বাংলাদেশের

সমাজ ও অর্থনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করে। বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার এ'সময় ব্যাপক রদবদল ঘটে এবং বাংলাদেশের শিল্প, বিশেষত বস্ত্রশিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। এ'দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই করুণ অধ্যায়ের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ঢাকা ফ্যাক্টরির চিঠি ও হিসাব বইগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

ভারতের বুকে ইংরেজদের প্রথম ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয় ১৬১৩ সালে সুরাটে। তখন থেকেই বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইংরেজরা তৎপর হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক কেন্দ্র ও বস্ত্র উৎপাদনের অঞ্চল হিসেবে ঢাকার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ১৬৬৬ সালে ঢাকা ফ্যাক্টরিটি স্থাপিত হয়।[১২] প্রথম দিকে দ্বৈত শাসনের প্রতিক্রিয়া থেকে ঢাকা ফ্যাক্টরিও মুক্ত ছিল না। নওয়াবের কর্মচারীও ঢাকা ফ্যাক্টরির কর্মচারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ১৬৮৮-১৭৬৩'র মধ্যে ফ্যাক্টরিটি বহুবার বন্ধ হয়ে যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সংহত হওয়ার পর এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি।[১৩]

ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্সের চিঠি পত্র থেকে ফ্যাক্টরি'ও আড়ং গুলোর সাংগঠনিক কাঠামো ও এগুলোর তৎপরতার পরিচয় মেলে। এই 'ফ্যাক্টরি'গুলোয় কোন উৎপাদন হত না। উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল আড়ংগুলো। বস্ত্র উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ, উৎপাদিত বস্ত্রের তত্ত্বাবধান ও সেগুলো বাছাই করে রফতানীর উদ্দেশ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা করাই ছিল 'ফ্যাক্টরি'গুলোর প্রধান কাজ। সেরেস্তাদার, তাগাদগির, গোমস্তা, মুহুরী, জমাদার, বরকন্দাজ, মকিম—এ'সব কর্মচারীর মাধ্যমে ফ্যাক্টরি ও আড়ংএর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত।

ঢাকা তখন বস্ত্র উৎপাদনের সমৃদ্ধ কেন্দ্র। বাংলাদেশের বস্ত্রের খ্যাতি সে সময়ে বিশ্বজোড়া। ঢাকার মসলিনের খ্যাতি ৭৩ খ্রীস্টাব্দেই pliny'র রচনায় মেলে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসায়ে ঢাকার শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি কারণ ছিল। অন্যান্য অঞ্চলের তাঁতিরা কৃষি ও অন্যান্য কাজের ফাঁকে কাপড় বুনতো। ঢাকার তাঁতিরা ছিল সার্বক্ষণিক কারিগর। ফলে তাদের নৈপুণ্য ছিল অন্যদের চেয়ে বেশী। ঢাকার ভূমিতে উৎপাদিত হত বস্ত্রের জন্য শ্রেষ্ঠতম কাঁচামাল। এখানকার জল-বায়ু ও বাতাসের আর্দ্রতা ছিল মসলিন উৎপাদনের জন্য সর্বাধিক অনুকূল। সেই সাথে ছিল মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা।[১৪] এই প্রাকৃতিক ও রাজকীয় আনুকূল্য নিয়ে বাংলার তাঁতিরা যে বুনন নৈপুণ্য প্রদর্শন করতো তা ছিল বিস্ময়কর।

ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা এই বস্ত্র ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত হতে চাইবে—এটা ছিল স্বাভাবিক। ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে এ'দেশ থেকে পণ্যের যে চালান যেত, তার সিংহভাগ জুড়ে থাকত বস্ত্র। পর্তুগীজ বণিকরা ষোড়শ শতাব্দীতেই এ'দেশ থেকে ইউরোপে বস্ত্র রফতানী শুরু করে। ১৫৯২ সালে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। ১৬২৮ সালে এ'দেশ থেকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয় ৫০ হাজার খণ্ড বস্ত্র। ১৬৩১ থেকে কোম্পানীর কর্মচারীরা ইংলণ্ডে ছাপানো কালিকো কাপড়ের চালান পাঠাতে থাকে। ১৬৭৭ সালে এক লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ড ও ১৬৮০ সালে ৩ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাপড় এদেশ থেকে ইংলণ্ডে যায়।[১৫] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইংলণ্ডে বস্ত্র উৎপাদন শুরু হয়। কিন্তু ভারতীয় বস্ত্রের তুলনায় তা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। কিন্তু বস্ত্র ব্যবসায়ে বাংলার এই প্রাধান্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই আমদানী-রফতানীর চাকা ঘুরে গেল। ১৮১৪ সালে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে বস্ত্রের প্রথম চালান এসে ভিড়ল ভারতের বন্দরে।

বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের এই বিপর্যয়ের কারণ কি? এই প্রশ্নের আপাত গ্রাহ্য একটি সরল উত্তর—শিল্প বিপ্লব। বৃটেনের যন্ত্র বিপ্লবের কাছে বাংলার কারিগরদের নৈপুণ্য ও নিষ্ঠা পরাজিত হয়েছে—এই যুক্তির মধ্যে বিশ্বাসের ভিত্তি আছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আগ্রাসী ভূমিকার দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে প্রধান। বাংলাদেশের তাঁতিদের ধ্বংস প্রাপ্তি সম্পর্কে উইলিয়াম বোল্টস এর প্রদত্ত তথ্যের বিরুদ্ধে অতিরঞ্জনের অভিযোগ থাকলেও বাংলার তাঁতিরা যে ইংরেজ কোম্পানীর আগ্রাসী নীতির নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল এ'ধরনের বহুপ্রমাণ 'ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্সে'র চিঠি পত্রে আছে।

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সংহত করার পর ইংরেজ বণিকরা এ'দেশের বস্ত্র উৎপাদনের সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়।[১৬] উৎপাদন সংগঠনের এই পরিবর্তনই কার্যত এ'দেশের বস্ত্র শিল্পের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্সের' চিঠি-পত্র দলিলে এই পরিবর্তিত উৎপাদন সংগঠন এবং এর ফলে সৃষ্ট বস্ত্র শিল্পের ধ্বংস প্রক্রিয়ার অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়।

মোগল যুগে তাঁতিরা ছিল স্বাধীন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। নতুন উৎপাদন সংগঠনে স্বাধীনতা হারিয়ে এরা পরিণত হয় কোম্পানীর চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকে। বাধ্যতামূলক 'অগ্রিম ব্যবস্থা' বস্ত্র শিল্প ও তাঁতিদের জন্য ধ্বংস ও দুর্ভোগ ডেকে আনে। উৎপাদন যখন সীমিত ছিল তখন তাঁতিরা নিজেই পুঁজির যোগান দিত। কিন্তু চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় মহাজনদের কাছে তাদের ধরনা দিতে হয়। এই সুযোগেই বস্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোম্পানীর অগ্রিম বিনিয়োগের অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রথমে দাদনী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এই 'বিনিয়োগ' করা হত। পরে 'দাদনী' ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে কোম্পানী নিজের কর্মচারীদের মাধ্যমেই বিনিয়োগ কাজ চালাতে থাকে। ১৭৫৩ সালে দাদন ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ অপসারণ করে কোম্পানীর 'গোমস্তা'রাই বস্ত্র ব্যবসায়ে তাদের স্থান অধিকার করে নেয়। মোগল যুগে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল এভাবে তা নষ্ট হয়ে যায়। বস্ত্র ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য ইংরেজরা প্রথমে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত থেকেই পুঁজি সংগ্রহ করতো। ১৭৬৫ সালে দিওয়ানী লাভের পর পুঁজির কোন সমস্যাই তাদের ছিলনা।[১৭] পলাশী যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা বস্ত্র ব্যবসায়ে ইংরেজদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যান্য ইউরোপীয় ও দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিয়ে ইংরেজরাই হয়ে ওঠে বস্ত্র ব্যবসায়ের প্রধান চরিত্র। ফলে বিক্রেতার প্রাধান্য খর্ব হয় এবং ক্রেতার চাহিদা ও করুণার উপরই বাংলার বস্ত্র শিল্প ক্রমশঃ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঢাকা, জঙ্গীপুর ও কাশিমবাজার ফ্যাক্টরির চিঠি ও খাতাগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির এই দিকটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আকর হিসেবে বিবেচিত হবে।

নতুন ব্যবস্থানুযায়ী গোমস্তাদের মাধ্যমে তাঁতিদের অগ্রিম দেওয়া হত। অগ্রিম গ্রহণ করানোর জন্য তাঁতিদের উপর বল প্রয়োগ করা এমন কি তাদেরকে বন্দী ও প্রহার করার ঘটনা ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্সের চিঠি পত্র থেকে জানা গেছে। নারায়ণপুর আড়ং এর গোমস্তা কৃষ্ণধন মৈত্রের কাছে লেখা ঢাকা ফ্যাক্টরির দুটি চিঠিতে এ' ধরনের অত্যাচারের উল্লেখ আছে।[১৮] অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের তুলনায় ইংরেজরা তাঁতিদের অনেক কম মূল্য দিতে চাইত। এ' ব্যাপারে তাঁতিদের আপত্তি খুব একটা গ্রাহ্য করা হতনা। তারা অগ্রিম নিতে না চাইলে শাস্তির ভয় দেখানো হত। বাজিতপুর আড়ং এর গোমস্তা জানকীনাথ গুপ্তকে লেখা একটি চিঠিতে যে সব তাঁতি অগ্রিম দেয়ার ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে তাদের নাম ফ্যাক্টরিতে পাঠাতে বলা হয়। যাতে ফ্যাক্টরির কাজে বাঁধা

দেয়ার জন্য ঐ তাঁতিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায়। এই চিঠিতে তাঁতিদের আরও সতর্ক করে দিতে বলা হয় যে, নির্ধারিত মূল্যে কাপড় সরবরাহ না করলে ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে আর কোন কাপড় নেয়া হবেনা। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য গোমস্তাকেও সতর্ক করে দেয়া হয়।[১৯] গোমস্তাদের প্রতি এ'ধরনের হুমকী বিরল নয়। নারায়ণপুর আড়ং এর গোমস্তা বাবুরাম কোপরেকে লিখিত চিঠিতে বলা হয়, চুক্তি অনুযায়ী কাপড়ের সরবরাহ আদায় করতে না পারলে তাকে চাকুরীচ্যুত করা হবে।[২০]

এই 'অগ্রিম প্রথা' নানা দিক থেকে তাঁতিদের জন্য দুর্ভোগ বয়ে আনে। বাংলাদেশে সে সময় আরকট, কারেণ্ট, সিক্কাসহ বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার প্রচলন ছিল। ১৭৯৫ সালের পর পুরাতন সিক্কা মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা অপ্রচলিত হয়ে যায়। এতদসত্বেও ঢাকা ফ্যাক্টরি এই মুদ্রাতেই কর্মচারীদের বেতন ও তাঁতিদের অগ্রিম দিত। এর ফলে মুদ্রা বিনিময়ে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হত। 'আরকট' মুদ্রায় বেতন দেয়ার জন্য তিতবাদী আড়ং এর কর্মচারীদের একটি আবেদন এই সংগ্রহে পাওয়া গেছে।[২১] নারায়ণপুর আড়ং এর তাঁতিদের একটি আবেদনে দেখা যাচ্ছে, পুরাতন সিক্কামুদ্রা ভাঙ্গাতে গেলে পোদ্দাররা টাকা প্রতি এক আনা কেটে রাখত।[২২] এ' জন্য অনেকেই টাকার পরিবর্তে কড়ি নিতে চাইত।

এখানেই শেষ নয়। উৎপাদন চলাকালেও উপদ্রবের অন্ত ছিলনা। দ্রুত কাপড় সরবরাহের তাগাদা লেগেই থাকত। সেই সাথে বস্ত্রের নির্ধারিত মান বজায় রাখার ব্যাপারে ছিল কড়াকড়ি। প্রত্যাশিত মানের না হলে কোম্পানীর 'মকিম'রা উৎপাদন পর্যায়েই অনেক কাপড় নষ্ট করে দিত। উৎপাদিত কাপড় A থেকে F পর্যন্ত বিভিন্ন মান অনুযায়ী শ্রেণীকরণের পর প্রেরণ করা হত ফ্যাক্টরিতে। এই শ্রেণীকরণ ও মূল্য নিরূপণ প্রক্রিয়ায় প্রায়ই ঠকানো হত তাঁতিদের। অধিকাংশ সময়ই বিপুল পরিমাণ বস্ত্র প্রত্যাখ্যান করা হত এবং এর পরিবর্তে তাঁতিদের নতুন বস্ত্র সরবরাহ করার জন্য চাপ দেয়া হত। প্রত্যাশিত মানের নয়, এই অজুহাতে অনেক বস্ত্রের মূল্য নিরূপণ করা হত অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণী অনুযায়ী।

বস্ত্রের শ্রেণীকরণ ও মূল্য নিরূপণের এই প্রক্রিয়া চাষীদের ক্রমশঃ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করে দেয়। ঢাকা ফ্যাক্টরির কাগজপত্রের মধ্যে ফ্যাক্টরির কর্মকর্তা জন পেটার সনের সাথে তাঁতিদের 'স্বেচ্ছায়' সম্পাদিত একটি চুক্তিপত্র পাওয়া গেছে। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী : 'অগ্রিম টাকার বিনিময়ে তাঁতিদের কাপড় সরবরাহ করতে হত, ফ্যাক্টরি কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণীকরণ ও মূল্য মেনে নিতে হত এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রত্যাখাত বস্ত্রের জন্য সরবরাহ করতে হত নতুন বস্ত্র কিংবা ক্ষতিপূরণ দিতে হত।'[২৩] এ'ধরনের 'স্বেচ্ছা-চুক্তি' বাংলার বস্ত্র ও তাঁতিদের ধ্বংস প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রত্যাখ্যাত বস্ত্রের জন্য নতুন বস্ত্র সরবরাহ না করা পর্যন্ত কিংবা ক্ষতিপূরণ না দেয়া পর্যন্ত নতুন করে অগ্রিম দেয়া হত না। প্রত্যাখাত বস্ত্রও আটকে রাখা হত কোম্পানীর ফ্যাক্টরিতে। ফলে এগুলো খোলা বাজারে বিক্রি করার কোন সুযোগও ছিলনা তাঁতিদের। এ'ভাবে তারা ক্রমশঃ ঋণগ্রস্ত ও অসহায় হয়ে পড়ে। কোম্পানীর অসম শর্ত মেনে নেয়া ছাড়া তাদের আর উপায় ছিলনা। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকেই ভিটে-মাটি ছেড়ে পালিয়েছে। চাঁদপুর আড়ং এর একটি চিঠিতে ১৪ জন তাঁতির পলায়ন ও একজনের মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে।[২৪] পলাতকদের পরে গ্রেফতার করে কোম্পানীর ঋণ শোধের জন্য বাধ্য করা হত। অনেকেই স্বেচ্ছায় ফিরে এসে দেনা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নতুন করে কোম্পনীর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পৈত্রিক পেশার মায়া ত্যাগ করে দিনমজুর বা

মৎস্যজীবীর কাজ বেছে নিয়েছে। পলাতক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে কেউ কেউ। যারা পালাতে পারতনা তাদের বন্দী করা হত দেনার দায়ে। সর্বস্ব ক্রোক করে তাদের কাছ থেকে দেনা আদায়ের চেষ্টা করা হত। কারাগারে বন্দীদের আহার ও অন্যান্য খাতে যে ব্যয় তা যোগ করা হত তাদের দেনার হিসাবে। এই দেনার বোঝা মাথায় নিয়েই মুক্তি লাভের পর আবার নতুন করে কোম্পানীর সাথে তাদের চুক্তিবদ্ধ হতে হত। কোন ভাবেই এই দেনার হাত থেকে মুক্তি ছিলনা। মৃত্যুর পরও এর জের চলত। মৃতের সম্পত্তি ক্রোক করা হত, অনেক সময় মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র বা নিকটাত্মীয়দের ওপর বর্তাতো এই ঋণের বোঝা।

ফ্যাক্টরি করেসপন্‌ডেন্সের দলিল গুলো থেকে প্রাপ্ত বাংলার বস্ত্র শিল্পের ধ্বংস-প্রক্রিয়ার এই বিবরণ থেকে এ দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি করুণ চিত্র পাওয়া যায়। গবেষকগণ আলোচ্য সূত্রাবলী থেকে প্রচুর উপাদান ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিদেশী বণিকরা এ দেশের বস্ত্র ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হয়েছিল তাদের নিজেদের স্বার্থেই। তাদের বিনিয়োগ এদেশের বস্ত্র শিল্পে কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলেনি, একে সমৃদ্ধতর ও বিকশিত করেনি। বরং এদের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আগ্রাসী আঘাতে এই শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথম দিকে এ দেশের বস্ত্র উৎপাদনকে তারা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কারণ এ'টি ছিল তাদের মুনাফার উৎস। কিন্তু ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্প কিছুটা শক্তি সঞ্চয়ের পর একে প্রতিযোগিতামুক্ত করার জন্য বৃটেনের পার্লামেণ্টে ভারতীয় বস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে ১৭০০ ও ১৭২০ সালে পর পর দুটি আইন পাশ করা হয়। এই সামগ্রিক ঔপনিবেশিক নীতির ফলেই বৃটেনে যখন শিল্প বিপ্লবের জোয়ার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মঞ্চে তখন চলছে বিশিল্পায়নের (deindustrialization) করুণ নাটক। ঢাকা ফ্যাক্টরিও এই প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি পায়নি। ১৭৮৭ সালে এই ফ্যাক্টরি থেকে ৫০ লক্ষ টাকার বস্ত্র রফতানী করা হয়। ১৮১৩ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৩৮,১১৪ টাকায়। বস্ত্র ব্যবসা আর লাভজনক বিবেচিত না হওয়ায় ১৮১৭ সালে ঢাকা ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায়। এ ভাবেই নষ্ট হয় বাংলার কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্য। পরে আর কখনো এই ভারসাম্য অর্জিত হয়নি।

ঢাকা ফ্যাক্টরির পত্রাবলী থেকে আরও কিছু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আমরা পাই। কোম্পানীর কর্মচারীদের নানা ধরনের দুর্নীতি ও অন্যায় কাজের উল্লেখ আছে অনেক চিঠিতে। এ ধরনের একটি ঘটনার বিবরণ আছে গ্রন্থকারের দীর্ঘ ভূমিকায়। ঢাকা ফ্যাক্টরির রতন চাঁদ তেওয়ারি অন্যান্য কর্মচারীর সহযোগিতায় একটি 'পঞ্চায়েত' গঠন করে। এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাঁতিদের কাছ থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয় ৪৭ হাজার ঢাকা (আরকট)। ঘটনাটি ঢাকা ফ্যাক্টরির কর্মকর্তা জন বেব এর গোচরে এলে তিনি এ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্তে রতন চাঁদ দোষী সাব্যস্ত হয়।[২৫]

কোম্পানীর গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীর ভূমিকা শুধু ফ্যাক্টরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় এরা নতুন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সমাজ-রাজনীতির কর্তৃত্ব নিয়ে জমিদার তালুকদারদের সাথে এ'দের সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল। এই দুই শ্রেণীর বিরোধ ও সংঘাতের কিছু উল্লেখ এ' সব চিঠি পত্রে আছে। বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনীতেতে এই নবোদ্ভূত চাকুরীজীবী শ্রেণীর ভূমিকা ও প্রভাবের বিষয়টি গবেষকদের অধিকতর মনোযোগ দাবী করে।

তিনটি ফ্যাক্টরির হিসাবের খাতায় কোম্পানীর বিনিয়োগ ও বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কে বেশ কিছু পরিসংখ্যান ও তথ্য আছে। জঙ্গীপুর ও কাশিমবাজার ফ্যাক্টরির হিসাব খাতা থেকে পাওয়া যাবে সিল্ক উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলী। হিসাব খাতা লেখার ব্যাপারে ফ্যাক্টরি কর্মচারীদের দক্ষতাও লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের তালিকা, কাপড়ের দাম, বিনিয়োগের হিসাব, ফ্যাক্টরির দৈনিক/মাসিক আয়-ব্যয়, চালান—এ'সব বিবরণাদি নিখুঁত ভাবে হিসাব খাতায় লেখা হত। তাঁতিদের ব্যক্তিগত নামের হিসাবপত্রও পাওয়া গেছে এই সংগ্রহে।

রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজগুলো বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। মাল (ভূমি রাজস্ব), সায়ের (শুল্ক), বাজীনামা (বিবিধ কর)—এই তিন ধরনের রাজস্ব আয়ের বিবরণই প্রাপ্ত দলিল গুলোতে পাওয়া যায়। এই সংগ্রহের মধ্যে আছে: জাহাঙ্গীরনগর ও মেদিনীপুর জালামোর চাকলার রাজস্ব হিসাবের দুটি খাতা, বিভিন্ন ধরনের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত কৃষ্ণনগর বলন্দিয়ার আয়ের হিসাব, মাদক দ্রব্যের শুল্ক হিসেবে পাওয়া মুর্শিদাবাদের রাজস্ব আয়, একটি তালুকের হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল, বালিয়া ঘাটি ফেরীর নিলাম সংক্রান্ত কাগজপত্র, চব্বিশ পরগণার কালেক্টরেটের ৩৬ টি পরওয়ানা, একটি সনদ, একটি খতিয়ান, একটি লাটবন্দী (নীলাম যোগ্য জমির বিবরণ), ৫টি ইস্তেহার, একটি চালান, ৫টি দস্তক, দৈনন্দিন রাজস্ব আয়ের হিসাব, ৭টি তৌজি এবং চব্বিশ পরগণার ও কলকাতার রাজস্ব হিসাব। এই কাগজগুলো ১৭৭৭-১৮১৩ সালের। এই সময়ের মধ্যে, পাঁচশালা, দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এ'দেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। দলিল গুলোতে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার কিছু সাক্ষ্য মেলে। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে অনেক জমিরই হাতবদল হয়। দশশালা বন্দোবস্ত অনুযায়ী রাজস্ব আদায় না করায় জমি নিলামের একটি 'লাটবন্দী' এই সংগ্রহে আছে।[২৬] চব্বিশ পরগণার পাঁচটি ইস্তেহারে ও রাজস্ব অনাদায়ের জন্য জমি নীলামের উল্লেখ আছে।[২৭] অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের নির্দেশ দিয়ে জারী করা হত 'পরওয়ানা'। এই গ্রন্থে সংগৃহীত পরওয়ানা গুলোর কোন কোনটি জারী করা হয়েছিল কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান একজনকে সনাক্ত করেছেন। তিনি মালিক আবদুল ওয়াহিদ—ক্লাইবের দিওয়ান নবকৃষ্ণ দেবের কাছে যাঁকে তালুকদারি হারাতে হয়েছিল। পরে ওয়ারেন হেস্টিংস এর সময়োপিতায় তা ফিরে পান।[২৮]

মামলার বিবরণ ও আদালতের নথি থেকে সে সময়ের বিচার ব্যবস্থার মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস দুটি প্রাদেশিক কোর্ট সদর দিওয়ানী আদালত ও সদর ফৌজদারী আদালতের অধীনে প্রতি জেলায় দুটি করে আদালত গঠন করেন। কর্ণওয়ালিসের সময় জেলা আদালতগুলোতে কোন ফৌজদারী মামলার শুনানী হতনা। কোলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় স্থাপিত চারটি আপীল আদালতেই শুধু ফৌজদারী মামলার শুনানী হত। পরে অবশ্য জেলা আদালতেও এ ধরনের মামলার শুনানীর বিধান হয়। হুগলী জেলা আদালতের তিনটি ফৌজদারী মামলার বিবরণ এতে আছে।[২৯]

এ'সব আদালতের বিচারক হতেন দু'জন ইংরেজ সিভিলিয়ন। এঁদের পরামর্শ দেয়ার জন্য থাকতেন একজন এ'দেশীয় মুফতী। হিন্দু-মুসলমান সবার জন্যই ছিল মুসলিম ফৌজদারী বিধান। মামলার রায় দেয়ার আগে বিচারকদ্বয় এই মুসলমান মুফতীর অভিমত (ফতোয়া) চাইতেন।

মামলার কার্যক্রম পরিচালিত হত তিনটি ভাষায়। শুনানী হত বাংলায়, মুফতী তাঁর ফতোয়া দিতেন ফার্সীতে, এবং বিচারকের রায় হত ইংরেজীতে।

ঢাকার আপীল কোর্টের ১৯টি, হুগলী জেলা আদালতের ৭টি ও সদর দিওয়ানী আদালতের ১টি মামলার বিবরণ এতে সংগৃহীত হয়েছে। ঢাকা আপীল কোর্টের মামলা গুলোর সব কটিই ফৌজদারী ধরনের। মুসলিম ফৌজদারী বিধানানুযায়ীই এ'সব বিচার পরিচালিত হয়েছে। এই বিধান অনুযায়ী কোন নিহত ব্যক্তির সন্তান বা নিকটাত্মীয় হত্যা-কারীকে ক্ষমা করে দিতে পারত। এ ধরনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ এখানে আছে।[২৯]

বাংলাদেশের তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তি—রামমোহন রায়, হাজী মোহাম্মদ মোহসীন ও রাণী ভবানী দেবীর তিনটি মামলার বিবরণ আছে এই সংগ্রহে।

রামমোহনের মামলার যে বিবরণ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই মামলার কোন উল্লেখ নেই।[৩০] রামমোহনের সাথে রাধাকৃষ্ণরায়, কর্তারাম রায় ও অন্যান্যদের এই মামলার শুনানী হয়েছিল হুগলী জেলা আদালতে। হাজী মোহাম্মদ মোহসীনের মামলাটি তাঁর সৎবোন মন্নুবেগমের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে। রানী ভবানী দেবীর মামলাটি উঠেছিল সদর দিওয়ানী আদালতে।

জর্জ বোগলের কাগজগুলোর মধ্য থেকে তাঁর ব্যক্তিগত কিছু বাণিজ্য উদ্যোগ জানা যায়। কুচবিহারের মহারাজা, ভুটানের দেবরাজ ও তিব্বতের লামার সাথে তাঁর যোগাযোগের কিছু সূত্র আছে।

ব্রায়ান হডসনের শব্দ সংগ্রহ সম্ভবতঃ ইংরেজ পাঠকদের কথা বিবেচনা করেই তৈরী করা হয়েছিল বলে ড: আনিসুজ্জামান অনুমান করেছেন। নেপাল ও তিব্বতের ভাষা ; সাহিত্য ও ধর্ম সম্পর্কে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করে হডসন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বীরভূম ও অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের কাগজগুলোও গবেষকদের কাছে মূল্যবান মনে হতে পারে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের ভূমিকা এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান সংযোজন। প্রাপ্ত চিঠিপত্র ও দলিল থেকে আহরিত তথ্য তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। ঐতিহাসিকের প্রখ্য ও সমাজবিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে তিনি প্রাপ্ত দলিলগুলোর গুরুত্ব ও মূল্য নির্দেশ করেছেন। পরিশিষ্টে সংযোজিত বিভিন্ন তথ্যও তাঁর সযত্ন পরিশ্রমের সাক্ষ্য দেয়।

'ফ্যাক্টরি করেসপনডেন্সে' অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমাদেরকে যে সংগ্রহ উপহার দিয়েছেন ভবিষ্যৎই তার গুরুত্ব ও মূল্য নির্ণয় করবে। আমাদের বিবেচনায় তাঁর এই আবিষ্কার নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বলিত। আমাদের ভাষা-সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণার জন্য তাঁর এই আবিষ্কারের গুরুত্ব অচিরেই অনুভূত হবে। গবেষকদের কাছে ফ্যাক্টরির করেসপনডেন্স একটি মূল্যবান আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে নিঃসন্দেহে।

গোলাম মুস্তাফা

তথ্যনির্দেশ

১ Catalogue of the Bengali and Assamese Manuscripts in the Library of the India Office, James Fuller Blumhardt, London, 1924.

২ A handlist of uncatalogued Bengali Manuscripts in the India Office Library and Records, Anisuzzaman, 1975

৩ Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records, Anisuzzaman, India Office Library, 1981, p. 19.

৪ বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৮

৫ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, সুকুমার সেন, কলিকাতা, ১৩৭৬ (১৯৬৭), পৃ. ৪

৬ চিঠি-পত্রে সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড, পঞ্চানন মণ্ডল, বীরভূম, ১৯৫৩

৭ প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা, ১৯৪২

৮ Factory correspondence and other Bengali documents, Anisuzzaman, p. 2

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪১

১২ বিভিন্ন সূত্রে ঢাকা ফ্যাক্টরি স্থাপিত হওয়ার বিভিন্ন তারিখ (১৬৬৬, ১৬৬৮, ১৬৬৯) উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ১৬৬৬ কেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১৪ The Cotton weavers of Bengal, Debendra Bijoy Mitra, Calcutta, 1978, pp. 154-55, 161, 174

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১১

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২

১৭ The Economic History of Bengal, Vol-I, N. K. Sinha, Calcutta, 1965, pp 11-12

১৮ 10 Bengali 4038 (53, 63), in Factory Correspondence, pp-140-141

১৯ 10 Bengali 4021 (107), Ibid, p. 45

২০ 10 Bengali 4022 (63), Ibid, p. 51

২১ 10 Bengali 4033 (41), Ibid, p. 118

২২ 10 Bengali 4030, (23), Ibid, p. 93

২৩ 10 Bengali 4061, Ibid, pp. 211-12

২৪ 10 Bengali 4026 (47), Ibid, p. 74

২৫ Ibid, p. 15

২৬ 10 Bengali 4092, Ibid, p. 235

২৭ 10 Bengali 4093, Ibid, p. 235

২৮ Ibid. p. 17

২৯ 10 Bengali 4100 (1), Ibid, p. 241

৩০ Selection from official letters and Documents relating to the life of Raja Rammohan Roy, Vol-I (1792-1830), Calcutta, 1938